এক জাদুকরের গল্প

খন্দকার মাহমুদুল হাসান

জাদুকরেরা ছাড়া আর কেউ তো জাদু জানে না, তাই তারা অন্যদের থেকে আলাদা। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী এমন এক মানুষ, যার ভাষায় জাদু আছে, কথায় জাদু আছে, যার হাতে আছে এক জাদুর কলম। সেই কলম দিয়ে ছোটোদের জন্যে তিনি যা লেখেন তাই মোহাবিষ্ট করে ফেলে। কথাগুলো বললাম এই গুণী লেখকের একজন পাঠক হিসেবে, তাঁর শিশুসাহিত্যের বই পড়ে। আমার বিশ্বাস, তিনি জাদুকর ছাড়া আর কিছু নন। তিনি যে শুধু শিশুসাহিত্যিক তা তো নয়; তিনি কবি, তিনি গল্পকার, তিনি ঔপন্যাসিক, চিত্রশিল্পী, সম্পাদক, পরিব্রাজক, আরও কতকিছু। সবদিকেই তিনি অনন্য। কিন্তু আমি তাঁর শিশুসাহিত্য নিয়ে কথা বলছি। পড়ে বলছি। বানিয়ে বলছি না একটুও।

'শাদা ঘোড়া'র কথাই ধরি। সেই ঘোড়াটাকে বিজয় পেয়েছিল মাতলাগাঙের ওপারে মাঠের মধ্যে একটা খাদ থেকে। পাওয়ার বছর দুয়েকের মধ্যেই ওর গায়ের রং আরও ধবধবে হল। কপালের মাঝখানের বাদামি দাগটা আরও অনেক সুন্দর হল। বিজয় ওর নাম রাখল শাদাপাল। এরপর থেকে ঘোড়াটা ওর নিত্যসঙ্গী।

মল্লিকবাবুদের বাড়ির গরু চরিয়ে সন্ধেবেলায় ফেরার সময় বিজয়ের কাঁধে ঝোলানো ঘাসের পুঁটলি দেখে শাদাপালের খুশি দেখে কে! একদিন রাজাবাবু বিজয়কে ডাকিয়ে এনে শাদা ঘোড়াটা কিনতে চাইলেন। তাঁর মেয়ে টুকটুকের বেড়ানোর জন্যে ঘোড়াটা চাই। সকালে কাজে যাবার সময় ঘোড়াটা রেখে পঞ্চাশ টাকা নিয়ে যেতে বললেন। বিজয় জানে, রাজাবাবুর যখন ইচ্ছে হয়েছে তখন তিনি শাদাপালকে নিয়েই ছাড়বেন। কিন্তু ওকে সে কিছুতেই হাতছাড়া করতে পারবে না।

তাই নিশুতি রাতে আকাশের তারা ছাড়া যখন কেউ জেগে নেই তখন শাদাপালকে নিয়ে গ্রাম ছাড়ল বিজয়। কিন্তু ভোর হতেই রাজবাড়ির পেয়াদারা ধরে ফেলল তাকে। কিছুটা পথ নিয়ে গিয়ে ঘাড়ে রদ্দা কষে ওকে তাড়িয়ে দিয়ে শাদাপালকে নিয়ে গেল রাজবাড়িতে।

সুপুরি গাছের বলয় দেখে বছর গুণতে জানত সে। তার জন্মের বছর হয়েছিল সেই গাছ। তার মা মারা যাওয়ার সময় গাছটায় বলয় ছিল পাঁচটা, আর বাবা মারা যাওয়ার সময় বলয় ছিল সাতটা। শাদাপালকে নিয়ে বাড়ি ছাড়ার সময় বারোটা বলয় ছিল।

এবারে সে প্রতিজ্ঞা করল, ষোলোটা বলয় পূর্ণ হবার আগেই রাজাকে পথের ধুলোয় শোয়াবে।

শাদা পালকে হারিয়ে হতাশ বিষণ্ণ বিজয় পথে দিশাহারা বসে থাকতে থাকতে শাদা পালের হ্রেষাধ্বনি শুনে উৎকর্ণ। কাকতালীয়ভাবে রাজবাড়ি থেকে পালিয়ে এল শাদাপাল। তারপর বিজয়কে নিয়ে ছুট লাগিয়ে বহু-উ দূরে তিনদিকে নদী দিয়ে ঘেরা এক গাঁয়ে এসে থামল। সেখানে এক বুড়ির সঙ্গে তার দেখা হল। তার কাছেই জানল, মড়ক লেগে সেখানকার গরু-বলদ প্রায় সবই মরে যাওয়ায় চাষাবাদ বন্ধ হয়ে গেছে। কেউ দুধও খেতে পায় না। নদীর মাছ, শাকপাতা আর ডাব খেয়ে কোনও রকমে মরতে মরতে বেঁচে আছে হাড়-জিরজিরে কিছু মানুষ।

গরুর রোগবালাইয়ের যে চিকিৎসা রাখাল বিজয়ের জানা ছিল তার ওপর নির্ভর করে সে লতাপাতা আর শেকড়ের মাধ্যমে অবশিষ্ট গরুগুলোকে সারিয়ে তুলল। গ্রামে এল নতুন জীবন। গ্রামবাসী তাকে মাথায় তুলে নিল। এবারে সে তাদেরকে নিজের জীবন কাহিনি খুলে বলায় বিজয়ের গাঁয়ের সেই রাজার সঙ্গে এই গ্রামের লোকেরা যুদ্ধ করার প্রতিজ্ঞা করল।

বুড়ির সাহায্য নিয়ে যুদ্ধের অস্ত্রের সন্ধানে বাঁশের ভেলায় চেপে সাতদিন সাত রাত দাঁড় বেয়ে শাদাপালকে সঙ্গে করে তিরন্দাজদের দেশে গেল সে। বুড়ির কাছেই সে শুনেছিল, তিরন্দাজেরা তাদের দেশে বিদেশিদের দেখলেই মেরে ফেলে।

তিরন্দাজেরা ঠিকঠিকই হামলা চালাল। তিরবিদ্ধ শাদাপালসহ বিজয়কে ঘিরে ফেলল তারা। কিন্তু গাছের পাতার রস লাগিয়ে চিকিৎসা করে শাদাপালের ক্ষত সারিয়ে তুলে সম্মান জানাল। সেদেশের রাজা জানালেন, শাদা ঘোড়া তাদের দেবতা। এবারে রাজাকে নিজের জীবনকাহিনি খুলে বলায় রাজা তাকে একশো ধনুক ও একশো তির আর বাঁশি দিলেন। তাই নিয়ে শাদাপালসহ বুড়ির গ্রামে ফিরে এল সে। তারপর একদিন দলবেঁধে তির-ধনুক নিয়ে রাজবাড়িতে গিয়ে হাজির হল।

রাজার পেয়াদারা মস্ত-মস্ত তির-ধনুক দেখে থমকে গেল। বর্শা হাতে বেরিয়ে আসা রাজার বুক ঘেঁসে তির ছুটে গেল। রাজা পথের ধুলোয় লুটিয়ে প্রাণরক্ষা করলেন।

শাদাপালকে ছুটিয়ে রাজার কাছে গিয়ে রাজাকে ধুলো থেকে তুলে রাখাল বিজয় ঘোষণা করল যে, তার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছে। এবারে রাজা খুশি হয়ে অতিথি হিসেবে বরণ করে নিলেন। বিজয়কে নিয়ে অন্দরমহলে গেলেন। রানিমা তাদের মেয়ে টুকটুককে তুলে দিলেন বিজয়ের হাতে। এরপর টুকটুককে নিয়ে শাদাপালের পিঠে চড়ে সে রোজ বেড়াতে যায়। মন খারাপ হলে দূর মাঠে গিয়ে আপনমনে বাঁশি বাজায়।

এই হল শাদা ঘোড়ার গল্প। যেন রূপকথা। কিন্তু অলৌকিকত্বের প্রতাপ তেমন নেই। এখানে রোগের চিকিৎসা জাদুমন্ত্রবলে হয় না। হয় গাছপাতার রসে, ভেষজগুণের ব্যবহার করে। এখানে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে দৈত্যদানব লাগে না, মানবীয় শক্তিতে অশুভের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয় মানুষ। অলৌকিকতার ছোঁয়া ছাড়াই মর্ত্যের মানুষের লৌকিক শক্তির বিজয়ের কথা শুনতে পাই আমরা। আর ভাষা? সেকথা আর বলব কী! একেবারে কোমল মধুমাখা। বিজয়ের মা-বাবার ঘুমিয়ে পড়াটা

যে চিরনিদ্রা তা বোঝা যায় 'আর উঠল না' দেখে। এ বড়ই চমৎকার উপস্থাপন-কৌশল। বাক্যগুলো সহজ-সরল। কঠিন শব্দ ও যুক্তাক্ষর যতটা সম্ভব দূরে রাখা হয়েছে। পড়ার সময় মনে হয় যেন অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর পাশে বসে গল্প শুনছি। তাঁর সঙ্গে গল্প করার সময় যা মনে হয় ঠিক তেমনই মনে হয় এই গল্প পড়ার সময়ও। এ তো পড়া নয়, যেন শোনাও। লীলা মজুমদার যথার্থই বলেছিলেন, এই লেখকের 'শাদা ঘোড়া' পড়ে ভেবেছিলাম কি ভালো কি ভালো!' অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ছোটদের দ্বিতীয় বই 'হীরু ডাকাত' পড়ে বলেছেন, 'এ যে আরও ভালো, মনকে নাড়া দেয়। রূপকথার রূপ ধরে ইতিহাস কথা কয়।'

(সূত্র লীলা মজুমদার, রূপকথার রূপ ধরে ইতিহাস, আজকাল, কলকাতা, ১৯ মে ১৯৮৭)

শিশুসাহিত্যের যে নিজস্ব রূপ থাকতে হয় তা বোঝা যায় অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর লেখা পড়ার সময়। তাঁর নিজস্ব ভাষা দেখেই চিনে নেওয়া যায়। একজন সাহিত্যিকের জন্যে এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা অবনীন্দ্রনাথকে চিনি তাঁর ভাষা দেখেই। চিনি উপেন্দ্রকিশোরকেও। অমরেন্দ্র চক্রবর্তীকেও স্পষ্টভাবে চেনা যায় তাঁর ভাষাতেই। এ যেমন পদ্যে, তেমনি গদ্যেও। যাঁদের তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতার সুযোগ হয়েছে, কিংবা শ্রবণ-মাধ্যমে তাঁর বাক্য-গঠন শৈলী সম্পর্কে ধারণা লাভের সুযোগ হয়েছে, তাঁরা এ বই পড়লে বুঝতে পারবেন যে নিজস্ব কথনরীতিকে সাহিত্যে রূপান্তরের দক্ষতা তাঁর কতটা। এই ভাষায় মায়া আছে। এই ভাষায় জাদু আছে।

'তালগাছের ডোঙা' বইটা তিনি আমায় ভালোবেসে উপহার দিয়েছিলেন। তাতে আছে–

আমার একটা ডোঙা ছিল–
তালগাছের ডোঙা।
'ডোঙা' তোমরা বুঝলে না তো?
নৌকো, নৌকো, নৌকো।
হুবহু ঠিক নৌকোও নয়, নৌকোর আত্মীয়।
ডোঙা আমার বড্ড ছিল প্রিয়।

আহা কী প্রাণ ছুঁয়ে যাওয়া ভাষা! লোকজ জীবনের প্রতি কী দারুণ টান!

'আমাজনের জঙ্গলে' হারিয়ে যাওয়া এক শিশুর সন্ধান মেলে তাঁর সাহিত্যে, যে এক বনবাসী শিশুর সঙ্গে ছবির ভাষায় কথা বলে, অর্থাৎ ছবি এঁকে এঁকে তার সঙ্গে প্রকাশ করে মনের ভাব। শিশুটিকে ছবিতে সে তার শহর দেখায়, যে শহরে শুধুই দালানকোঠা, কোনও গাছপালা নেই, নদী নেই। বনবাসী শিশুটি ভাবে এটা বালির শহর, মানুষের নয়। কারণ, গাছপালা আর প্রকৃতি ছাড়া মানুষ কি বাঁচতে পারে? এভাবে তিনি প্রকৃতির জন্যে তাঁর মনে যে ভালোবাসা আছে তা সঞ্চার করেছেন পাঠকের মনেও। মহাশ্বেতা দেবী লিখেছিলেন, নিষ্পাপ শিশুমনকে অরণ্য, নদী ও অরণ্যসন্তানদের কাছে নিয়ে যাওয়া যে খুব দরকার, তা বুঝেই তো তিনি 'আমাজনের জঙ্গলে' লেখেন।

(সূত্র মহাশ্বেতা দেবী, চাঁদের নিজের দেশে, আজকাল, কলকাতা, ২০ জুলাই ২০০২)

'বরফের বাগান', 'ঋষিকুমার', 'গৌর যাযাবর', 'গরিলার চোখ', 'মাতলাগাঙের ভূত', 'লিচুবাগানের চৌকিদার', 'ছেঁড়াকাঁথার গল্প', 'পাখির খাতা', 'তালগাছের ডোঙা', 'হরিণের সঙ্গে খেলা', 'টিয়াগ্রামের ফিঙেনদী', 'জল-বাতাসা', 'ভূতের বাঁশি', 'আমার বনবাস', 'চোখে দেখা গল্প' প্রভৃতি বই তিনি লিখেছেন ছোটদের জন্যে। কী গদ্যে, কী পদ্যে এক আশ্চর্য চৌম্বক-শক্তি আছে তাঁর ভাষায়, যা আটকে ধরে রাখে পাঠককে। সেই ভাষা একান্তই ছোটদের।

'হীরু ডাকাত'-এ যে পদ্য তারও আছে নিজস্বতা। এতে তিনি বলছেন–

দস্যুর দল তিন ছেলেকে বাঁধল গাছের গোড়ায়
পাঁচজনে লাফ দিয়ে উঠল পাঁচটি কালো ঘোড়ায়
উনিশজনের হাতে জ্বলছে মশাল।
এসব কবে ঘটছে জানো? সেটা উনিশশো সাল।

এতে স্পষ্ট যে, এই ঘটনার মধ্যে ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস একজন ডাকাতের। যে ডাকাতের মনটা বড়ই নরম। গরিবের দুঃখে যার কেঁদে ওঠে প্রাণ। যে মন্দ লোকের ত্রাস, কিন্তু বন্ধু দরিদ্রের। লুটে নেওয়া ধন সে বিলিয়ে দেয় গরিবদের মধ্যে। তাদের দরজায় রেখে আসা সম্পদে অভাব ঘোঁচায় দীনহীনেরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হীরু ডাকাতের পরিণতিটা হয় করুণ। হীরু একজন ডাকাত। কাহিনির যবনিকায় তার জীবনেরও যবনিকা নেমে আসে। আমাদের প্রাণ যে কেঁদে ওঠে এই ডাকাতের জন্যে তার কৃতিত্ব অর্থাৎ আমাদেরকে কাঁদানোর কৃতিত্ব অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর। তিনিই তো সফল লেখক যিনি কাঁদাতে পারেন, আবার হাসাতেও পারেন। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী নিজে যা ভাবেন অন্যকেও তা ভাবতে বাধ্য করার ক্ষমতা রাখেন। জাদুকর ছাড়া আর কার আছে এই ক্ষমতা? কাজেই তিনি যদি জাদুকর না হবেন তাহলে আর কে আছে জাদুকর?

লেখক পরিচিতি

(২৫ অগস্ট, ১৯৫৯-২৮ জানুয়ারি, ২০২১) শিশুসাহিত্যিক, গবেষক, কবি। বাংলাদেশ ও ভারত থেকে প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা প্রায় দু'শো। শিশুসাহিত্যের গ্রন্থ শতাধিক। বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ে শিশুসাহিত্যের অন্যতম শীর্ষ সম্মাননা বাংলাদেশ শিশু অ্যাকাডেমি-অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরস্কারসহ বাংলাদেশ ও ভারত থেকে অনেক সম্মাননায় ভূষিত।